শাস্ত্রের শাসন বনাম সাম্যের সংকীর্তন: ষোড়শ শতকের বাংলায় সামাজিক রূপরেখা

The Rule of Scriptures vs. The Chorus of Equality: A Socio-Historical Outline of 16th-Century Bengal

---

গবেষক পরিচিতি: অজয় কুমার দে

স্বাধীন গবেষক (আঞ্চলিক ইতিহাস ও সাহিত্য) এবং প্রাবন্ধিক

নিবন্ধিত লোকশিল্পী, লোকপ্রসার প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এসসি (রসায়ন), অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ADIT), ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সার্টিফিকেট (NCTC)

যোগাযোগের ঠিকানা: পোড়াডাঙ্গা ,সাটুই ,মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

ইমেল: deykrajay@gmail.com ফোন নম্বর: +918016841269

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-1046-3555

সারসংক্ষেপ **(Abstract):** ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গসমাজে স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর অনুশাসন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমতাবাদী আদর্শের মধ্যে এক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিতগণের প্রবর্তিত কঠোর ধর্মাচরণ, অস্পৃশ্যতা এবং জন্মভিত্তিক বর্ণাশ্রম প্রথা তৎকালীন সমাজের নিম্নবর্গীয় ও প্রান্তিক মানুষকে চরম অবমাননার অভিমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এইরূপ সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন একটি যুগান্তকারী সামাজিক প্রতিরোধ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আলোচ্য প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হইল, স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদর্শগত দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচন করা এবং জাতিভেদ প্রথা উন্মূলনে বৈষ্ণব দর্শনের সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম জন্মগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়া 'ভক্তি'-কে ঈশ্বরলাভের এবং সামাজিক স্বীকৃতির মূল মাপকাঠি রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যাহা স্মার্তগণের আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের মূলে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিয়াছিল। নগর-সংকীর্তনের ন্যায় অভিনব গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার ব্যবহার করিয়া শ্রীচৈতন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এক বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে (Public Sphere) আনয়ন করিয়াছিলেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্য, জীবনীগ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক দলিলের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধটি মূল্যায়ন করিবে যে, কিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন তৎকালীন সমাজে জাতপাতের লৌহকপাট চূর্ণ করিয়া একটি আপেক্ষিক সামাজিক সমতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছিল।

মূলশব্দ **(Keywords)** : ১. স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ, ২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ৩. জাতিভেদ প্রথা, ৪. সামাজিক প্রতিরোধ, ৫. ভক্তি আন্দোলন।

Abstract: In 16th-century Bengal, a historical and sociological conflict emerged between the rigid orthodoxies of Smarta Brahmanism and the egalitarian ideals of Gaudiya Vaishnavism. The stringent religious practices, untouchability, and the birth-based caste system (Varnashrama) propagated by Smarta scholars like Raghunandan plunged the marginalized and lower-caste populations of contemporary society into extreme degradation. Against this socio-cultural backdrop, the Gaudiya Vaishnava movement, led by Sri Chaitanya Mahaprabhu, emerged as a revolutionary social resistance. The primary objective of this paper is to unravel the nature of the ideological conflict between Smarta Brahmanical hegemony and Gaudiya Vaishnavism, and to analyze the sociological role of Vaishnava philosophy in the eradication of the caste system. Transcending birth-based identities, Gaudiya Vaishnavism established 'Bhakti' (devotion) as the ultimate criterion for spiritual attainment and social recognition, striking a direct blow to the ritualistic Brahmanical dominance of the Smartas. Utilizing the innovative tool of mass movement like 'Nagar-Sankirtan' (congregational street chanting), Sri Chaitanya brought people from all strata of society into a broader, inclusive public sphere. Based on contemporary Bengali literature, hagiographies, and historical documents, this paper evaluates how the Gaudiya Vaishnava movement shattered the iron gates of caste discrimination and successfully established a degree of relative social equality and human rights in contemporary society.

Keywords: Smarta Brahmanism, Gaudiya Vaishnava Philosophy, Caste System, Social Resistance, Bhakti Movement.

সূচিপত্র

- শিরোনাম , সারসংক্ষেপ (Abstract) ও মূলশব্দ (Keywords) (পৃ:০১)
- ১.০.ভূমিকা:ষোড়শ শতকের বাংলার সমাজচিত্র,গবেষণার প্রেক্ষাপট (পৃ:০২-০৭)
- ১.১. তৎকালীন সমাজচিত্র ও ধর্মীয় অবক্ষয় (পৃ:০৫)
- ১.২. সমকালীন সাহিত্যের সাক্ষ্য ও উদ্ধৃতি (পৃ:০৫)
- ১.৩. গবেষণার প্রেক্ষাপট (Research Context) (পৃ:০৬)
- ২.০. প্রাক-চৈতন্য যুগ এবং স্মার্ত অনুশাসন:রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ব' (পৃ:০৮-১৫)
- ২.১. শাস্ত্রীয় কঠোরতা ও বর্ণাশ্রমের নিগড় (পৃ:০৯)
- ২.২. সমকালীন সাহিত্যের সাক্ষ্য (পৃ:০৯)
- ২.৩. সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন (পৃ:১৪)
- ৩.০. গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের উদ্ভব ও সমতার দর্শন (পৃ:১৬-২০)
- ৩.১. জ্ঞান ও কর্মমার্গ হইতে ভক্তি-মার্গে উত্তরণ (পৃ:১৬)
- ৩.২. শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব (পৃ:১৭)
- ৩.৩. সমাজতাত্ত্বিক রূপান্তর ও জন্মপরিচয়ের বিলুপ্তি (পৃ:১৮)
- ৩.৪. অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের সামাজিক প্রয়োগ (পৃ:১৯)
- ৪.০. সংকীর্তন: আধ্যাত্মিকতার আবরণে এক অভিনব সমাজ-বিপ্লব (পৃ:২১-২৫)
- ৪.১. শাস্ত্রীয় যজ্ঞের বিকল্প এবং গণ-আন্দোলনের সূচনা (পৃ:২১)
- ৪.২. নব জনপরিসর (Public Sphere) গঠন ও সামাজিক সমতা (পৃ:২২)
- ৪.৩. প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন ও কাজীর দর্পচূর্ণ (পৃ:২৩)
- ৪.৪. সমকালীন সাহিত্যে বর্ণাশ্রম পতনের চিত্র (পৃ:২৩)
- ৫.০. প্রান্তিক মানুষের স্বীকৃতি ও জাতিভেদের অবলুপ্তি (পৃ:২৬-২৯)
- ৫.১. শাস্ত্রীয় ভিত্তিমূল ও ভক্তির সর্বজনীনতা (পৃ:২৬)
- ৫.২. যবন হরিদাস: অস্পৃশ্যতা হইতে 'নামাচার্য' পদে উত্তরণ (পৃ:২৭)
- ৫.৩. রামানন্দ রায়: জ্ঞানদানের অধিকারে জাতিভেদের বিলুপ্তি (পৃ:২৭)
- ৫.৪. অন্যান্য প্রান্তিক দৃষ্টান্ত এবং সমাজ-বিপ্লব (পৃ:২৮)
- ৬.০. উপসংহার ও সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন (পৃ:৩০-৩৩)
- ৬.১. অহংকারের পতন ও মানবিকতার জয়গান (পৃ:৩০)
- ৬.২. মাতৃভাষার ক্ষমতায়ন ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ (পৃ:৩১)
- ৬.৩. চূড়ান্ত মূল্যায়ন (পৃ:৩২)
- ৭.০. তথ্যসূত্র (References) ও গবেষক পরিচিতি(পৃ:৩৪-৩৫)

ভূমিকা: ষোড়শ শতকের বাংলার সাধারণ সমাজচিত্র এবং গবেষণার প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী এক ক্রান্তিকাল বা যুগসন্ধিক্ষণ রূপে পরিগণিত হয়। এই কালখণ্ড কেবল রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী ছিল না, পরন্তু ইহা ছিল বাঙালি জাতির মনন, সমাজ ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের প্রসূতিগৃহ। সুলতানি আমলের অবসানের প্রাক্কালে এবং মোগল আধিপত্যের বিস্তারের পূর্ববর্তী সময়ে, বাংলার সমাজজীবন এক অদ্ভুত স্থবিরতা ও অবক্ষয়ের আবর্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

তৎকালীন সমাজচিত্র ও ধর্মীয় অবক্ষয়: ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার হিন্দুসমাজ মূলত বর্ণাশ্রম প্রথার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত ছিল। বহিরাগত রাজনৈতিক শক্তির আধিপত্যের কারণে হিন্দু সমাজপতিগণ আত্মরক্ষার তাগিদে ধর্মের চতুর্পার্শ্বে এক দুর্ভেদ্য ও কঠোর শাস্ত্রীয় প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে কলিযুগের যে অমানিশার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, প্রাক্-চৈতন্য বঙ্গসমাজ যেন তাহারই এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি রূপে প্রতীয়মান হইতেছিল—

"ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া।

কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ॥" *[১]*

তাৎপর্য: হে রাজন্! বলবান কালের প্রভাবে দিনে দিনে মানুষের ধর্ম, সত্য, শৌচ (পবিত্রতা), ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল এবং স্মৃতিশক্তি ক্রমশ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইতে থাকিবে।

ভাগবতের এই শ্লোকের মর্মার্থ ষোড়শ শতকের বাংলার বুকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত এবং নৈয়ায়িকগণের পাণ্ডিত্যের অহংকার সমাজের আধ্যাত্মিক চেতনাকে গ্রাস করিয়াছিল। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিতগণ 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' বা আটাশটি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপকে শৃঙ্খলিত করিয়াছিলেন।

উপমা: প্রবহমান নদী যখন আপন গতিপথ হারাইয়া বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়, তখন শৈবাল ও পঙ্কে যেমন তাহার নির্মল জলরাশি কলুষিত হইয়া পড়ে, তৎকালীন বঙ্গসমাজও তেমনই আধ্যাত্মিকতার সলিলধারা হারাইয়া কেবল আচারসর্বস্বতা, অস্পৃশ্যতা এবং কুসংস্কারের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

সমকালীন সাহিত্যের সাক্ষ্য ও উদ্ধৃতি: ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের দম্ভের পদতলে পিষ্ট হইয়া সমাজের বৃহত্তর অংশ—শূদ্র, অন্ত্যজ ও নারী—চরম লাঞ্ছনার শিকার হইতেছিল। পরমার্থ চর্চার পরিবর্তে লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা এবং জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবই ধর্মের একমাত্র মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমকালীন সমাজচিত্রের এক নিখুঁত ও প্রামাণ্য দলিল আমরা বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। সমাজমানসের এই ধর্মান্ধতা ও অবক্ষয় দর্শনে ব্যথিত হইয়া অদ্বৈত আচার্য যে ক্রন্দন করিতেন, তাহার বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

"দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।

পুত্তলি করহ কেহ দিয়া বহু ধন॥

ধন নষ্ট করে, পথি মাগিয়া খায়।

তবু এই সব কর্ম্মে লোক আনন্দ পায়॥" *[২]*

অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা পরমার্থের বিন্দুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া, মানুষ কেবল দম্ভভরে মনসা (বিষহরি) পূজা করিত এবং প্রতিমা নির্মাণে বিপুল অর্থ অপচয় করিত। ধর্মের এই বাহ্যিক আড়ম্বরে মানবতার কোনো স্থান ছিল না।

গবেষণার প্রেক্ষাপট **(Research Context):** উপরে বর্ণিত এই দমবন্ধ করা সামাজিক প্রেক্ষাপটেই শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। আধুনিক ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের আলোকে বিচার করিলে দেখা যায় যে, চৈতন্য-আন্দোলন কেবল একটি ধর্মীয় পুনর্জাগরণ (Religious Revival) ছিল না; ইহা ছিল স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যের (Hegemony) বিরুদ্ধে এক নীরব অথচ সুদৃঢ় সামাজিক বিপ্লব।প্রকৃত গবেষণার প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা ঠিক এই স্থানেই নিহিত রহিয়াছে। এতদিন পর্যন্ত

মূলধারার ইতিহাস চর্চায় ভক্তি আন্দোলনকে কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে মূল্যায়ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধের মুখ্য অন্বিষ্ট হইল, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে স্মার্ত অনুশাসন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আদর্শগত দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচন করা। কিরূপে 'সাম্যের সংকীর্তন'-এর ন্যায় একটি অহিংস গণ-আন্দোলন সমাজের প্রান্তিক মানুষকে জাতিভেদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিল, সমকালীন ঐতিহাসিক দলিল ও সাহিত্যের ভিত্তিতে তাহার একটি বস্তুনিষ্ঠ রূপরেখা নির্মাণ করাই এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য। [৩]

ফুটনোট ও রেফারেন্স:

- [১] কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ (দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ১)। গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর দ্বারা প্রকাশিত।
- [২] দাস, বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়)। গৌড়ীয় মিশন, কলিকাতা। এই উদ্ধৃতিটি তৎকালীন সমাজের আচারসর্বস্বতা ও পারমার্থিক শূন্যতার এক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল।
- [৩] চক্রবর্তী, রমাকান্ত (১৯৮৫)। Vaisnavism in Bengal: 1486-1900. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা। (এই গ্রন্থে ভক্তি আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের সহিত ইহার দ্বন্দ্বের বিস্তারিত আলোচনা দৃষ্ট হয়, যাহা বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠনে সহায়ক)।

প্রাক-চৈতন্য যুগ এবং স্মার্ত অনুশাসন: রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' এবং বর্ণাশ্রম প্রথার কঠোরতা

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদ্বীপ ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র চর্চার এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের এই অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেও, নবদ্বীপের সমাজজীবন ছিল পারমার্থিক প্রেম ও ভক্তিহীন এক শুষ্ক মরুভূমি। বহিরাগত মুসলিম বা 'যবন' শাসনকর্তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণে হিন্দু সমাজপতিগণ সর্বদা এক অবচেতন ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছিলেন। ফলস্বরূপ, স্বীয় ধর্ম ও সমাজকে বিধর্মীদের প্রভাব হইতে সুরক্ষিত রাখিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় অনুশাসনের এক লৌহবেষ্টনী নির্মাণ করিলেন।

এই রক্ষণশীল প্রতিরোধ ব্যূহের প্রধান স্থপতি ছিলেন নবদ্বীপের প্রখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রকার স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। তিনি হিন্দু সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' (আটাশটি খণ্ডে বিভক্ত স্মৃতিনিবন্ধ) রচনা করেন। মলমাস-তত্ত্ব, শুদ্ধি-তত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব, বিবাহ-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মানবজীবনের এমন কোনো ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল না, যাহা রঘুনন্দনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কঠোর অনুশাসনের বহির্ভূত ছিল।

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।

তত্র শ্রুতিং প্রমাণং স্যাৎ তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥" *(ব্যাসস্মৃতি)*

তাৎপর্য: প্রাক-চৈতন্য যুগে নবদ্বীপের সুপণ্ডিত স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য হিন্দুসমাজের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণার্থে 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' (যথা- তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব ইত্যাদি) রচনা করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য হইল—শ্রুতি (বেদ), স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে যদি মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তবে শ্রুতিই সর্বাগ্রে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে; এবং শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিলে স্মৃতিশাস্ত্রই প্রাধান্য লাভ করিবে। রঘুনন্দন এই শাস্ত্রীয় নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই তৎকালীন বঙ্গসমাজের দৈনন্দিন

জীবনযাত্রা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রীয় কঠোরতা ও বর্ণাশ্রমের নিগড়: রঘুনন্দনের এই 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' কেবল সমাজকে সুশৃঙ্খলই করে নাই, পরন্তু হিন্দু সমাজকে আচারসর্বস্বতার এক শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তৎকালীন সমাজে মনুসংহিতার সেই প্রাচীন ও সুকঠোর বিধানগুলি নবপর্যায়ে বলবৎ করা হয়, যেখানে শূদ্র ও প্রান্তিক মানুষের অধিকারকে সম্পূর্ণ রূপে খর্ব করা হইয়াছিল। মনুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে—

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ ন চ সংস্কারমর্হতি।

নাস্যাধিকারো ধর্মেঽস্তি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনম্॥" *[৪]*

তাৎপর্য: শূদ্রের অভক্ষ্য ভক্ষণে কোনো পাপ নাই (কারণ তাহার শুচিতা রক্ষার প্রয়োজন বিবেচিত হইত না), সে উপনয়নাদি কোনো বৈদিক সংস্কারের যোগ্য নহে। বৈদিক ধর্মাচরণে তাহার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই, এবং লৌকিক ধর্মাচরণেও তাহার কোনো নিষেধ বা বিধি নাই।

অর্থাৎ, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে শূদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণিকে শাস্ত্রীয়ভাবে সম্পূর্ণ ব্রাত্য ও অধিকারহীন করিয়া রাখা হইয়াছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের দম্ভ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল যে, নিম্নবর্ণের মানুষের ছায়া স্পর্শ করিলেও উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগণ সলিলস্নানের মাধ্যমে 'শুদ্ধি' লাভ করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ন্যায় ও তর্কের শুষ্ক কচকচিতে মগ্ন থাকিতেন, ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের কোনো অনুরাগ ছিল না।

সমকালীন সাহিত্যের সাক্ষ্য: তৎকালীন বিদ্বান সমাজের এই বিদ্যা-অহংকার ও পারমার্থিক শূন্যতার নিখুঁত চিত্র আমরা 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে অবলোকন করি। বৃন্দাবন দাস আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বিদ্যা-কুলে সবার আছয়ে অহঙ্কার।

ঈশ্বর-ভজনা কেহ না করে আধার॥

গীতায়, ভাগবতে যেবা করায় পঠন।

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার বদন॥" *[৫]*

অর্থাৎ, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের বিদ্যা এবং কুলীনত্বের অহংকারের কোনো সীমা ছিল না। যাঁহারা গীতা বা ভাগবত পাঠ করিতেন, তাঁহারাও কেবল শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেন; তাঁহাদের মুখে ভক্তি বা প্রেমের কোনো বাণী শ্রুত হইত না।

উপমা**:** উপমা প্রয়োগ করিয়া বলা যাইতে পারে—যেমন কোনো বিশাল ও প্রাচীন বৃক্ষকে পরগাছা বা স্বর্ণলতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রাণরস শোষণ করিয়া লয় এবং পরিশেষে বৃক্ষটিকে পত্রপুষ্পহীন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত করে; স্মার্ত অনুশাসন ও প্রায়শ্চিত্তের বিধানগুলিও তেমনই হিন্দু সমাজবৃক্ষকে আচারের কঠিন নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল।

তৎকালীন সমাজচিত্র : "চৈতন্য-পূর্ববর্তী বাংলার সমাজজীবন চরম বৈষম্য, কুসংস্কার এবং অস্থিরতায় পরিপূর্ণ ছিল।"

কঠোর বর্ণপ্রথা ও বৈষম্য: হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং অন্যান্য নিম্নবর্ণে কঠোরভাবে বিভক্ত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্র আধিপত্য পরিলক্ষিত হইত এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানবগণকে (যথা- চণ্ডাল, শবর) অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করা হইত। অস্পৃশ্যতা মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল।

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ ন চ সংস্কারমর্হতি।

নাস্যাধিকারো ধর্মেঽস্তি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনম্॥" (মনুস্মৃতি ১০.১২৬)

তাৎপর্য: তৎকালে বর্ণাশ্রম প্রথা কীরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল, মনুসংহিতার এই শ্লোকটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্লোকটির তাৎপর্য হইল—শূদ্রের কোনো পাতক নাই, সে কোনো রূপ বৈদিক সংস্কারের যোগ্য নহে; ধর্মানুষ্ঠানে তাহার কোনো অধিকার নাই। স্মার্ত অনুশাসনে এই সকল প্রাচীন বিধিনিষেধ পুনরায় কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। সমাজের নিম্নবর্গের মানবগণের প্রতি যে চরম অবজ্ঞা ও বঞ্চনা প্রদর্শিত হইত, তাহা এই শাস্ত্রীয় বিধানসমূহ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সমাজ যেন এক দমবন্ধ করা বর্ণাশ্রমের নিগড়ে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস: সাধারণ মনুষ্যের জীবনযাত্রা নানাবিধ কুসংস্কার, জ্যোতিষশাস্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র এবং তুকতাকের উপরি নির্ভরশীল ছিল। যুক্তিবাদী চিন্তাধারার চরম অভাব দৃষ্ট হইত।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।

দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

- (কঠোপনিষদ ১.২.৫)

তাৎপর্য: উপনিষদের এই শ্লোকটির মর্মার্থ হইল—অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়াও যাহারা নিজদিগকে অতিশয় বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের ন্যায় কেবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিয়া মরে। প্রাক-চৈতন্য যুগের সমাজচিত্র ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তৎকালীন ভণ্ড শাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকগণ নিজেরাই অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন, অথচ তাঁহারাই সমাজের কর্ণধার সাজিয়া বসিয়াছিলেন।

সাধারণ মানব সেই সকল 'অন্ধ' পথপ্রদর্শকের নির্দেশ মান্য করিয়া অন্ধবিশ্বাসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

নারীসমাজের শোচনীয় অবস্থা: সমাজে নারীগণের কোনো স্বাধীন সত্তা অথবা মর্যাদা বিদ্যমান ছিল না। কন্যাপণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথার ন্যায় অমানবিক প্রথাসমূহের কারণে নারীজীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥" *(মনুস্মৃতি ৯.৩)*

তাৎপর্য: রঘুনন্দনের স্মার্ত অনুশাসন প্রধানত মনুস্মৃতি ও পরাশর স্মৃতির ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই শ্লোকটি তৎকালীন বর্ণাশ্রম প্রথা এবং সামাজিক কঠোরতার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তাৎপর্য এই যে—নারীজীবনে কোনো রূপ স্বাধীনতার অবকাশ নাই; বাল্যকালে তিনি পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনতা স্বীকার করিয়া জীবনধারণ করিবেন। রঘুনন্দন এই সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া সমাজে নারীগণের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সমাজের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করিয়া এক দুর্লঙ্ঘ্য বর্ণাশ্রমের নিগড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ: তৎকালে সুলতানি শাসন চলিলেও স্থানীয় জমিদার ও শাসকবর্গের অত্যাচারে সাধারণ প্রজার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্র কৃষকগণ চরম শোষণের শিকার হইত।

ধর্মীয় অবক্ষয় :উক্ত যুগে ধর্মের নামে আধ্যাত্মিকতার অপেক্ষা বাহ্যিক আড়ম্বর ও অনাচার অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আচারসর্বস্বতা ও শাস্ত্রের আধিপত্য: ধর্মের অন্তর্নিহিত ভক্তি অথবা প্রেম সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল বাহ্যিক আড়ম্বর, ব্যয়বহুল

যজ্ঞানুষ্ঠান এবং কঠোর ব্রত-উপবাস। ধর্ম কেবল কতিপয় যান্ত্রিক নিয়মের সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল।

ভক্তির পরিবর্তে ভীতির উপাসনা: মানব ঈশ্বরকে ভক্তিভরে নহে, বরং অমঙ্গলের ভয়ে পূজা করিত। সর্পদংশনের ভয়ে মনসা পূজা, মহামারীর ভয়ে শীতলা পূজা অথবা ব্যাঘ্রের ভয়ে দক্ষিণরায়ের পূজা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ইহা লৌকিক ধর্মের উত্থানের কাল ছিল।

"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥"

-(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭.৪)

তাৎপর্য: গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের উপাসনার প্রকৃতি বর্ণনার্থে এই শ্লোকটি বিবৃত করিয়াছেন। ইহার মর্মার্থ হইল—সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানবগণ দেবগণের উপাসনা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসদিগের পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেত ও নিম্নস্তরের শক্তিগণের আরাধনা করিয়া থাকেন। প্রাক-চৈতন্য যুগের বঙ্গসমাজ তামসিকতার চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিল। শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে দৃষ্ট হয় যে, ঈশ্বরকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে ভজনা করিবার পরিবর্তে মানব তখন জাগতিক ভীতি ও স্বার্থসিদ্ধির বশবর্তী হইয়া লৌকিক ও তামসিক উপাসনায় মগ্ন হইয়াছিল। ইহা আধ্যাত্মিকতার চরম অধঃপতনেরই পরিচায়ক।

তন্ত্র সাধনা ও নৈতিক স্খলন: সমাজের একটি বৃহৎ অংশ, বিশেষত কতিপয় কাপালিক ও বামমার্গী সাধক, ধর্মের নামে মদ্যপান, মাংস ভক্ষণ এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মচর্চার আবরণে সমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়াছিল।

"মদ্যং মাংসং চ মৎস্যং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।

মকারপঞ্চকং প্রাহুর্যোগিনাং মুক্তিদায়কম্॥" (কুলার্ণব তন্ত্র)

তাৎপর্য: তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই পঞ্চমকার সাধকের মুক্তির কারণ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'মদ্য' বলিতে ব্রহ্মতালু হইতে ক্ষরিত সুধা, 'মাংস' বলিতে বাকসংযম বা জিহ্বা ছেদন এবং 'মৈথুন' বলিতে কুণ্ডলিনী শক্তির সহিত পরমশিবের মিলনকে বোঝাইলেও, তৎকালীন কপট সাধকগণ এই সকল আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। ধর্মচর্চার আবরণে তাহারা এই পঞ্চমকারকে স্থূল ভোগবিলাস, সুরাপান এবং অবাধ যৌনাচারের ছাড়পত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

পণ্ডিতগণের দম্ভ: যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ অথবা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা নিজ জ্ঞান লইয়া অহংকার করিতেন এবং সাধারণ মানবকে ধর্মের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করাইবার পরিবর্তে কেবল তাহাদের শোষণ করিতেন।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।

হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥" (নারদীয় পুরাণ / হরিভক্তিবিলাস)

তাৎপর্য: সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে রঘুনন্দনের স্মার্ত অনুশাসন সমাজকে সাময়িক শৃঙ্খলা প্রদান করিলেও, কালক্রমে উহা মানবাত্মাকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দমবন্ধ করা পরিবেশ হইতে মুক্তির জন্যই সমাজে ভক্তিবাদের উদ্ভব এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উপরিউক্ত শ্লোকের তাৎপর্য হইল—এক জন চণ্ডালও যদি ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন; অপরপক্ষে ঈশ্বরভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ কুক্কুরখাদকের অপেক্ষাও অধম। সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়নে ইহা বলা যায় যে, স্মার্ত অনুশাসনের এই চরম কঠোরতা এবং বৈষম্যই পরোক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে এক উদার, সাম্যবাদী ও প্রেমময় ভক্তি-আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন: এইরূপ অমানবিক ও কঠোর অনুশাসনের ফলে বঙ্গসমাজে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্মার্ত বিধানগুলি মানুষের আত্মিক পবিত্রতার অপেক্ষা দৈহিক শুচিতা ও যান্ত্রিক লোকাচারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিত। পদে পদে প্রায়শ্চিত্তের বিধান সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছিল।

সামাজিক এই অসাম্য ও নিপীড়নকে ধর্মের আবরণে বৈধতা প্রদান করা হইয়াছিল, যাহাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শোষণ (Institutionalized Oppression) বলা যাইতে পারে। সমাজের বৃহত্তর অংশ যখন এই ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের ভারে জর্জরিত ও দিশাহারা,সামাজিক বৈষম্য এবং ধর্মীয় এই চরম অবক্ষয়ের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ হইতে মানবকে মুক্তি প্রদান করিতেই তৎপরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবের অন্তরে 'প্রেম' ও 'ভক্তি'র বাণী প্রচার করত সমাজে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিলেন।

ফুটনোট ও রেফারেন্স:

- [৪] মনুসংহিতা (দশম অধ্যায়, শ্লোক ১২৬)। অনুবাদ ও সম্পাদনা: পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন। এই শ্লোকটি তৎকালীন সমাজে শূদ্রের অধিকারহীনতার একটি প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় দলিল।
- [৫] দাস, বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়)। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের দম্ভ ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা বর্ণনায়।
- [৬] বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ (১৯৯২)। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্মার্ত প্রভাব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা। (এই গ্রন্থে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের উদ্ভব ও সমতার দর্শন: জন্মগত পরিচয়ের বদলে 'ভক্তি'-র প্রাধান্য

স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের শ্বাসরুদ্ধকর ও নিরেট পাষাণপ্রাচীরে প্রথম এবং প্রবলতম আঘাত হানিয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন। তৎকালীন সমাজ যখন আচারের শুষ্ক কাষ্ঠে পরিণত হইয়াছিল এবং নিম্নবর্গের মানুষ শাস্ত্রীয় নিপীড়নে দিশাহারা, ঠিক সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের উদ্ভব এক যুগান্তকারী সামাজিক মুক্তির বার্তা বহন করিয়া আনে। এই নবজাগরণের মূল ভিত্তি কেবল কোনো অভিনব ধর্মমত প্রচার ছিল না, বরং ইহার অন্তরতম প্রদেশে নিহিত ছিল এক সুগভীর মানবতাবাদী ও সমতাবাদী দর্শন।

জ্ঞান ও কর্মমার্গ হইতে ভক্তি-মার্গে উত্তরণ: প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরলাভের তিনটি মুখ্য মার্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ। স্মার্ত পণ্ডিতগণ কর্মমার্গ (কঠোর আচার-অনুষ্ঠান) এবং জ্ঞানমার্গকে (বেদান্ত ও ন্যায় চর্চা) সমাজজীবনে নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উভয় মার্গেই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি এবং বৈদিক সংস্কারের প্রয়োজন হইত, যাহা কেবল উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত ছিল। ফলস্বরূপ, সমাজের বৃহত্তর প্রান্তিক অংশ ঈশ্বর আরাধনার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই দুরূহ ও কন্টকাকীর্ণ পথে সাধারণ গৃহী, নিরক্ষর বা প্রান্তিক মানুষের মুক্তিলাভ একপ্রকার অসম্ভব। অতএব, তিনি 'ভক্তি'-কেই পরমার্থ লাভের একমাত্র ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, কর্ম ও জ্ঞান হলো ভক্তি-প্রাসাদে প্রবেশের সিঁড়ি মাত্র। রূপ গোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে শুদ্ধা ভক্তির সংজ্ঞায় বলেছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এমন এক প্রেমময় অনুশীলন—যাতে অন্য কোনো পার্থিব বাসনা নেই, এবং যা জ্ঞান ও কর্মের আবরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তা-ই হলো উত্তমা ভক্তি।অবারিত সোপান রূপে নির্বাচন করিলেন।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব: শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্রের অহংকার খণ্ডন করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রকেই হাতিয়ার করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, ভক্তি থাকিলে অতি হীনকুলে জন্মাইয়াও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে কপিলদেবের মুখে দেবহূতির প্রতি যে অমোঘ বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাহাকেই পরম প্রামাণ্য রূপে গ্রহণ করিলেন—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" *[৭]*

তাৎপর্য: অহো! যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার (ভগবানের) পবিত্র নাম বিরাজমান, তিনি চণ্ডাল (শ্বপচ) কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। যাঁহারা ভক্তিভরে তোমার নাম কীর্তন করেন, বুঝিতে হইবে তাঁহারা পূর্বজন্মে সমস্ত তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও তীর্থস্নান সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহারাই প্রকৃত আর্য।

কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় (শ্রীমদ্ভাগবতম ১১.১৪.২০)

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥"

অর্থ: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, "হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যদর্শন (জ্ঞানমার্গ), বর্ণাশ্রম ধর্ম (কর্মমার্গ), বেদপাঠ, তপস্যা বা সন্ন্যাস আমাকে ততটা বশীভূত করতে পারে না, যতটা আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি আমাকে বশীভূত করতে পারে।"

তাৎপর্য: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, শুষ্ক জ্ঞান বা যান্ত্রিক কর্মের চেয়ে ভক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী। ভগবানের হৃদয় কেবল প্রেমের দ্বারাই জয় করা সম্ভব, শুষ্ক পাণ্ডিত্য বা কঠোর তপস্যা দিয়ে নয়।

সমাজতাত্ত্বিক রূপান্তর ও জন্মপরিচয়ের বিলুপ্তি: ভাগবতের এই যুগান্তকারী ঘোষণাকে শ্রীচৈতন্যদেব কেবল শাস্ত্রের পুথিতে আবদ্ধ না রাখিয়া, বঙ্গসমাজের বাস্তব পটে প্রয়োগ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, আধ্যাত্মিক জগতে জন্মগত পরিচয়ের বিন্দুমাত্র মূল্য নাই। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ইহা ছিল এক অভিনব সাম্যবাদ (Egalitarianism)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এই সমতাবাদী চেতনার এক অভূতপূর্ব স্ফুরণ লক্ষিত হয়—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।

সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।

কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥" *[৮]*

অর্থাৎ, নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই কেহ ঈশ্বর-ভজনার অযোগ্য হয় না, এবং উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মাইলেও কেহ আপনা-আপনি ভজনের যোগ্য বিবেচিত হয় না। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে জাতি বা কুলের কোনো বিচার নাই; যিনি ভক্তিপরায়ণ তিনিই শ্রেষ্ঠ, এবং যিনি অভক্ত তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও হীন।

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

-শ্রীমদ্ভাগবতম (১১.১৪.২১)

অর্থ: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমি কেবলমাত্র ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারাই লভ্য। আমার প্রতি এই অবিচল ভক্তি চণ্ডালকেও তার জন্মগত কলঙ্ক ও অস্পৃশ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করে তোলে।"

তাৎপর্য: এটি সমাজ সংস্কারের একটি অকাট্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ। কর্ম বা জ্ঞানমার্গে জন্মগত পবিত্রতা ও শুদ্ধাচারের যে কঠোর শর্ত ছিল, ভক্তিযোগ তা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই শ্লোকটি প্রান্তিক মানুষকে মূল স্রোতে নিয়ে আসার একটি বিরাট হাতিয়ার।

উপমা: আকাশের প্রখর সূর্যরশ্মি যেমন রাজপ্রাসাদের সুবর্ণচূড়া এবং দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটিরের উপর সমভাবে পতিত হইয়া উভয় স্থানকেই সমরূপে আলোকিত করে; অথবা প্রজ্বলিত হুতাশন যেমন সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ ও অপবিত্র ইন্ধনকাষ্ঠের ভেদ বিচার না করিয়া উভয়কেই ভস্মীভূত করিয়া সমরূপ পবিত্রতা প্রদান করে, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তির স্রোতও তেমনই ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের ভেদ মুছিয়া সমগ্র বঙ্গসমাজকে এক অভিন্ন সাম্যধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিল। [৯]

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের সামাজিক প্রয়োগ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি হইল 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রতিটি জীবাত্মা পরমাত্মারই যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন অংশ। অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার সহিত সৃষ্টির গুণগত কোনো পার্থক্য নাই, কেবল পরিমাণগত পার্থক্য বিদ্যমান। এই দর্শন সমাজদেহে এক সুদৃঢ় সমতাবাদী ভিত্তির জন্ম দিয়াছিল। যদি সকল জীবই সেই পরম সত্তার অংশ বা স্ফুলিঙ্গ হয়, তবে জন্মগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ এক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কৃত্রিম ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

" বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

-শ্রীমদভগবদ্গীতা (৫.১৮)

অর্থ: প্রকৃত জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যা ও বিনয় নম্র ব্রাহ্মণ, একটি গাভী, একটি হস্তী, একটি কুকুর এবং একজন চণ্ডাল (কুকুরভোজী)—সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখে থাকেন।

তাৎপর্য: গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজতত্ত্বে এই শ্লোকটির গুরুত্ব অপরিসীম। বাহ্যিক রূপ, জন্ম বা সামাজিক অবস্থান দিয়ে মানুষের বিচার করা যে অজ্ঞতার লক্ষণ, তা এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব জেনেছেন, তাঁর কাছে জন্মগত উচ্চ-নীচ ভেদ বলে কিছু থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন কেবল একটি ধর্মীয় মুক্তি প্রদান করে নাই, বরং যুগ যুগ ধরিয়া অবদমিত ও শাস্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট প্রান্তিক জনসমাজে আত্মমর্যাদা ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অভিনব হাতিয়ার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভক্তির এই প্লাবন স্মার্ত আধিপত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিমূলকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বাংলায় এক নতুন সমাজ-ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করে। [১০]

ফুটনোট ও রেফারেন্স:

- [৭] কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ (তৃতীয় স্কন্ধ, তেত্রিশতম অধ্যায়, শ্লোক ৭)। গীতাপ্রেস সংস্করণ। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতিভেদের অসারতা প্রমাণের জন্য এই শ্লোকটি গৌড়ীয় দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- [৮] কবিরাজ, কৃষ্ণদাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৬৬-৬৭)। এই উদ্ধৃতি তৎকালীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৈষ্ণবদের প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের এক সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক দলিল।
- [৯] বৈষ্ণব সাহিত্যে সূর্য ও অগ্নির উপমা বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা বোঝাইবার জন্য যে, ভক্তি অস্পৃশ্যতা মানে না। রূপ গোস্বামী প্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-তেও অনুরূপ উপমার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।
- [১০] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন (১৯৮৯)। Social Mobility in Bengal. প্যাপাইরাস, কলিকাতা। (এই গ্রন্থে ভক্তি আন্দোলনের ফলে নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক উত্থান ও সমতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে)।

সংকীর্তন: আধ্যাত্মিকতার আবরণে এক অভিনব সমাজ-বিপ্লব

স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের জগদ্দল পাষাণভার যখন বঙ্গসমাজের কন্ঠরোধ করিয়াছিল এবং পারমার্থিক পথ কেবল মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কুক্ষিগত ছিল, তখন শ্রীচৈতন্যদেব 'সংকীর্তন'-কে স্বীয় আন্দোলনের প্রধান আয়ুধ রূপে নির্বাচন করিলেন। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে অনুধাবন করা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রবর্তিত এই 'নগর-সংকীর্তন' কেবল একটি আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস বা ধর্মীয় উপাচার মাত্র ছিল না; বস্তুতপক্ষে ইহা ছিল ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের এক প্রবল, সুসংগঠিত এবং অভিনব সামাজিক প্রতিরোধ। পূর্বে ঈশ্বরের আরাধনা ছিল কেবল মন্দিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে আবদ্ধ। অব্রাহ্মণ, শূদ্র বা নারীর সেই দেবালয়ের পবিত্র আঙিনায় প্রবেশের অধিকার ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেই অবরুদ্ধ ধর্মকে মন্দিরের পাষাণবেদী হইতে মুক্ত করিয়া ধূলিমলিন রাজপথে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন।

শাস্ত্রীয় যজ্ঞের বিকল্প এবং গণ-আন্দোলনের সূচনা: স্মার্ত পণ্ডিতগণ যখন বেদ, উপনিষদ ও স্মৃতির জটিল বিধিনিষেধের বেড়াজালে ঈশ্বরপ্রাপ্তিকে এক ব্যয়বহুল ও দুরূহ কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের এক অমোঘ শ্লোককে উদ্ধৃত করিয়া সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রমাপার্ষদম্।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" *[১১]*

তাৎপর্য: কলিযুগে যাঁহারা সুমেধাসম্পন্ন (অর্থাৎ জ্ঞানী), তাঁহারা অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবৃত, অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু বাহিরে গৌরকান্তি বিশিষ্ট ভগবানকে 'সংকীর্তন' রূপ যজ্ঞের দ্বারাই আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। স্মার্তগণ নির্দেশিত অশ্বমেধ, রাজসূয় বা অন্যান্য ব্যয়বহুল বৈদিক যজ্ঞের অধিকার কেবল ধনী ও উচ্চবর্ণের ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব

'সংকীর্তন'-কে কলিযুগের শ্রেষ্ঠ 'যজ্ঞ' রূপে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া দরিদ্র, অশিক্ষিত ও প্রান্তিক মানুষের হস্তে ঈশ্বরলাভের শ্রেষ্ঠ চাবিকাঠি তুলিয়া দিলেন। অধিকারভেদের এই শাস্ত্রীয় প্রাচীর চূর্ণ হওয়ামাত্রই সংকীর্তন এক অভাবনীয় গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিল।

নব জনপরিসর (Public Sphere) গঠন ও সামাজিক সমতা: আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের আলোকে এই নগর-সংকীর্তনকে একটি অভিনব 'জনপরিসর' (Public Sphere) নির্মাণ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সংকীর্তনের উদ্দাম নৃত্য ও গগনভেদী ধ্বনি ছিল বহু শতাব্দীর শৃঙ্খলিত জনমানসের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের এক স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। এই মহামিলনের রাজপথে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র—সকলের ব্যবধান চিরতরে লুপ্ত হইয়াছিল।

সংকীর্তন এমন একটি মাধ্যম, যাহা এককভাবে সম্পন্ন করা সাধ্যতীত; ইহার নিমিত্ত প্রয়োজন সম্মিলিত অংশগ্রহণ। রাজপথের এই নামকীর্তনে যখন একযোগে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানব বাহু উত্তোলনপূর্বক নৃত্য করিতে লাগিল, তখন তাহা বর্ণাশ্রম ধর্মের অহংকারকে রাজপথের ধূলিতে অবলুণ্ঠিত করিল। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এ এই গণ-জাগরণের চিত্রটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে:

> "নগরিয়া লোক সব আনিয়া সম্বলে।
> মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খ বাজায়েন কুতূহলে॥"

ইহা কেবল ধর্মীয় উপাচার ছিল না, বস্তুত ইহা ছিল জাতপাতহীন এক সমান্তরাল ও সংঘবদ্ধ সমাজ নির্মাণের সার্থক প্রয়াস।

উপমা: প্রলয়ংকরী ঝটিকা যখন শুষ্ক অরণ্যানীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ধাবিত হয়, তখন তাহা যেমন সুবিশাল মহীরুহ এবং ক্ষুদ্র গুল্মলতার ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া উভয়কেই সমূলে উন্মূলিত করে; নগর-সংকীর্তনের উদ্দাম প্রেমোন্মত্ততা ও অশ্রুধারাও তদ্রূপ

সমাজদেহের জাতপাতের সমস্ত কৃত্রিম প্রাচীরকে ভাসাইয়া নিয়া বঙ্গসমাজকে এক অখণ্ড ও অভিন্ন সাম্যভূমিতে দণ্ডায়মান করাইয়াছিল।

প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন ও কাজীর দর্পচূর্ণ: এই সামাজিক জাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায় নবদ্বীপের 'কাজী দোলন' বা কাজীর আজ্ঞা লঙ্ঘনের ঘটনায়। সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় নবদ্বীপের তৎকালীন শাসক চাঁদ কাজী যখন রাজপথে সংকীর্তন নিষিদ্ধ করিলেন এবং মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেব বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত করিয়া যে বিশাল মশাল-মিছিল বা নগর-সংকীর্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তাগণ তাহাকেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম 'অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন' (Non-violent Civil Disobedience) রূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন [১২]। এই মিছিল নিছক ধর্মীয় ছিল না, ইহা ছিল রাষ্ট্রের স্বৈরাচার এবং উচ্চবর্ণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তির (Collective Consciousness) এক অভূতপূর্ব আস্ফালন।

সমকালীন সাহিত্যে বর্ণাশ্রম পতনের চিত্র: তৎকালীন সমাজমানসে এই বিপ্লবের যে কী সুগভীর প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহার এক নিখুঁত চিত্র আমরা বৃন্দাবন দাস প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে অবলোকন করি। সংকীর্তনের প্রভাবে সমাজের জাতিভেদের দম্ভ কীভাবে চূর্ণ হইয়াছিল, তাহার অনবদ্য বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"কীর্ত্তন আনন্দে সব একাকার হৈল।

কেবা কোন্ জাতি কেহো চিনিতে নারিল॥

বাহু তুলি' সবে নাচে, বলে 'হরি হরি'।

চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ নাচে একাঙ্গন ভরি'॥" *[১৩]*

অর্থাৎ, কীর্তনের অনাবিল আনন্দে সমাজের সকল স্তর একাকার হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল যখন স্বীয় জাতি-অহংকার বিসর্জন দিয়া একই অঙ্গনে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন কে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাহা আর কেহই স্মরণ রাখিতে পারিলেন না।

শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড):

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।

দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব সিদ্ধি হয়॥"

অর্থ: আহার, শয়ন বা যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো স্থানে হরিনাম গ্রহণ করা যায়। ইহার নিমিত্ত কোনো নির্দিষ্ট স্থান, কাল বা পবিত্রতার নিয়ম নাই; ইহাতেই সকল সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ হয়।

সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য: ইহা স্মার্ত ব্রাহ্মণগণের জটিল 'আচার-সর্বস্ব' ধর্মের প্রতি এক প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ। কর্মজীবী ও দরিদ্র মানবের পক্ষে সারাদিন উপবাস থাকিয়া বা শাস্ত্রীয় আচার মানিয়া পূজা করা সম্ভবপর ছিল না। এই উদ্ধৃতিটি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করে যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই বিনা আড়ম্বরে ঈশ্বরের আরাধনা সম্ভবপর।

উপসংহারে বলা যায়, আধ্যাত্মিকতার আবরণে আবৃত থাকিলেও সংকীর্তন প্রকৃতপক্ষে ছিল এক যুগান্তকারী সমাজ-বিপ্লব। ইহা বর্ণাশ্রমের পাষাণভিতে এক ভয়ংকর ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং শতাব্দীপ্রাচীন লাঞ্ছনার অবসান ঘটাইয়া সাধারণ বাঙালি সমাজকে আত্মমর্যাদা ও একতার এক নবতর আস্বাদ প্রদান করিয়াছিল। [১৪]

ফুটনোট ও রেফারেন্স:

- [১১] কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ (একাদশ স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোক ৩২)। কলিযুগে শাস্ত্রীয় যজ্ঞের পরিবর্তে নামকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এই শ্লোকটি বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম মূলভিত্তি।
- [১২] সেন, অমর্ত্য (২০০৫)। The Argumentative Indian. Farrar, Straus and Giroux. (অমর্ত্য সেন প্রমুখ আধুনিক চিন্তাবিদগণ শ্রীচৈতন্যের এই সংকীর্তন মিছিলকে নাগরিক অধিকার আদায়ের এক প্রাচীনতম অহিংস প্রতিবাদ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন)।
- [১৩] দাস, বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়)। সংকীর্তনে সামাজিক মিলনের এই চিত্রটি তৎকালীন সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক দলিল।
- [১৪] মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার (১৯৯৩)। ভক্তি আন্দোলন ও বাংলার সমাজ। কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা। (এই গ্রন্থে নগর-সংকীর্তনকে গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান)।

প্রান্তিক মানুষের স্বীকৃতি ও জাতিভেদের অবলুপ্তি: যবন হরিদাস, রামানন্দ রায় এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের সমাজ-বিপ্লবী সত্তা কেবল পুঁথির পৃষ্ঠায়, শাস্ত্রীয় বিতর্কে বা তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সমাজদেহে সমতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কেবল বাণী প্রচারই যথেষ্ট নহে, পরন্তু তাহাকে স্বীয় জীবনাচরণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা আবশ্যক। অতএব, তিনি বর্ণাশ্রমের লৌহশৃঙ্খল স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া প্রান্তিক, অন্ত্যজ ও তথাকথিত 'পতিত' শ্রেণিকে সমাজের মূল স্রোতে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের দম্ভকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বঙ্গসমাজে এক অভূতপূর্ব মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল।

শাস্ত্রীয় ভিত্তিমূল ও ভক্তির সর্বজনীনতা: উচ্চবর্ণের পণ্ডিতগণের অহংকার চূর্ণ করিবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন শাস্ত্রেরই এক অমোঘ বাণীকে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং 'ইতিহাস সমুচ্চয়'-এ বর্ণিত এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥" *[১৫]*

তাৎপর্য: ভগবান বলিতেছেন, চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি অভক্ত হন, তবে তিনি আমার প্রিয় নহেন; কিন্তু চণ্ডাল (শ্বপচ) কুলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিও যদি আমার ভক্ত হন, তবে তিনিই আমার সর্বাধিক প্রিয়। তাঁহাকে দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, এবং তিনি আমারই ন্যায় পরম পূজনীয়।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্লোকের আক্ষরিক প্রয়োগের মাধ্যমেই বাংলার বুকে এক নীরব কিন্তু সুতীব্র সামাজিক পালাবদলের (Social Status Reversal) সূচনা করিয়াছিলেন।

যবন হরিদাস: অস্পৃশ্যতা হইতে 'নামাচার্য' পদে উত্তরণ: এই পালাবদলের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল হরিদাসের জীবন। তৎকালীন স্মার্ত সমাজ যখন অহিন্দু বা যবনকে স্পর্শ করা, এমনকী তাহাদের ছায়ামাড়ানোকেও মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করিত, তখন শ্রীচৈতন্যদেব এক মুসলমান কুলে জন্মগ্রহণকারী হরিদাসকে পরম স্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। হরিদাস যখন স্বীয় জন্মপরিচয়ের হীনতাবশত শ্রীচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, মোরে না ছুঁইহ, মুই নীচ পামর," তখন চৈতন্যদেব তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে হরিদাসের স্পর্শে তিনি স্বয়ং পবিত্র হইলেন।

পরবর্তীকালে, সমগ্র নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্য এই যবন হরিদাসকেই 'নামাচার্য' বা নামকীর্তনের সর্বোচ্চ গুরুর উপাধিতে ভূষিত করিলেন। সমাজতত্ত্বের আলোকে ইহাকে কেবল ধর্মীয় উদারতা বলা চলে না; ইহা ছিল একটি সুপরিকল্পিত সামাজিক অন্তর্ঘাত, যাহা জন্মভিত্তিক আধিপত্যের (Ascribed Status) স্থলে গুণ ও ভক্তিভিত্তিক যোগ্যতাকে (Achieved Status) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

রামানন্দ রায়: জ্ঞানদানের অধিকারে জাতিভেদের বিলুপ্তি: দ্বিতীয় যুগান্তকারী দৃষ্টান্তটি স্থাপিত হয় গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক মিলনে ('রামানন্দ সংবাদ')। তৎকালীন মনুসংহিতা ও স্মার্ত বিধান অনুযায়ী শূদ্রের বেদপাঠ বা কোনো প্রকার পারমার্থিক জ্ঞানদানের অধিকার ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এক সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও শূদ্রকুলোদ্ভব রামানন্দ রায়ের নিকট হইতে সাশ্রুনেত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব ও প্রেমভক্তির নিগূঢ় রস শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা বর্ণাশ্রম প্রথার বুকে এক মোক্ষম কুঠারাঘাত—

"কিবাবিপ্র কিবাশূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥" *[১৬]*

> অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার জন্মগত নহে। ব্রাহ্মণ হউন, শূদ্র হউন অথবা সন্ন্যাসী হউন—যিনি ঈশ্বরতত্ত্বে জ্ঞানী, তিনিই গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য। একজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী কর্তৃক এক গৃহী শূদ্রকে স্বীয় গুরুর মর্যাদা প্রদান তৎকালীন হিন্দু সমাজের অচলায়তনে এক অভাবনীয় ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অন্যান্য প্রান্তিক দৃষ্টান্ত এবং সমাজ-বিপ্লব: কেবল হরিদাস বা রামানন্দ রায় নহেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন সমাজের অসংখ্য অবহেলিত মানুষকে বুকে টানিয়া লইয়াছিল। হুসেন শাহের রাজদরবারে উচ্চপদে আসীন থাকিবার 'অপরাধে' হিন্দু সমাজপতিগণ যখন রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে সমাজচ্যুত ও পতিত ঘোষণা করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব তখন তাঁহাদের উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব দর্শনের শ্রেষ্ঠ রূপকার রূপে বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনুরূপভাবে, সুবর্ণবণিক কুলোদ্ভব (তৎকালীন সমাজে যাঁহারা পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন) উদ্ধারণ দত্তকে পরম বৈষ্ণবের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এছাড়া, বৈষ্ণবদাস কালিদাস নামক এক ভক্ত জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিবার নিমিত্ত সমস্ত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ও ডোম শ্রেণির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার এই কার্যকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। [১৭]

উপমা: উপমা প্রয়োগ করিয়া বলা যায়—পরশমণির (স্পর্শমণি) অলৌকিক স্পর্শে যেমন মূল্যহীন ও মলিন লৌহখণ্ড অমূল্য সুবর্ণে রূপান্তরিত হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির স্পর্শও তেমনই সমাজের তথাকথিত 'পতিত', 'অস্পৃশ্য' ও 'হীন' মানবগণকে পরম পূজনীয় মহাপুরুষে রূপান্তরিত করিয়াছিল। স্মার্ত অনুশাসনের শুষ্ক ও কন্টকাকীর্ণ অরণ্য এই ভক্তি-অমৃতের স্পর্শে সহসা এক মনোরম পারিজাত কাননে পরিণত হইয়াছিল।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার সমাজতত্ত্বে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করিয়াছিল। তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মানুষের প্রকৃত পরিচয় তাহার বংশগৌরবে নহে, তাহার আত্মিক পবিত্রতা ও মানবিক মূল্যবোধে নিহিত। [১৮]

ফুটনোট ও রেফারেন্স:

- [১৫] সনাতন গোস্বামী / গোপাল ভট্ট গোস্বামী। হরিভক্তিবিলাস (দশম বিলাস)। 'ইতিহাস সমুচ্চয়' হইতে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি বৈষ্ণব সমাজে জাতিভেদের অসারতা প্রমাণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ছিল।
- [১৬] কবিরাজ, কৃষ্ণদাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, শ্লোক ১২৮)। এই শ্লোকটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সামাজিক সমতা ও মানবাধিকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘোষণাপত্র বলিয়া স্বীকৃত।
- [১৭] দাস, বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্যখণ্ড)। কালিদাস কর্তৃক অস্পৃশ্যদের উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং জাতপাতের বেড়া ভাঙ্গিবার এক বিশদ বিবরণ এখানে দৃষ্ট হয়।
- [১৮] বসু, রামশঙ্কর (২০০১)। মধ্যযুগের বাংলায় ভক্তি আন্দোলন ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা। (এই গ্রন্থে প্রান্তিক মানুষের উত্থানে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষিত হইয়াছে)।

উপসংহার ও সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন: বাংলার সমাজ ও মননে এই দ্বন্দ্বের সুদূরপ্রসারী প্রভাব

সমগ্র আলোচনার অন্তিমে উপনীত হইয়া নির্দ্বিধায় এই সমাজ-ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গদেশে স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের সংঘাত নিছক কোনো ধর্মতাত্ত্বিক বা আচারগত বিরোধ ছিল না; বস্তুতপক্ষে ইহা ছিল আধিপত্যবাদ (Hegemony) এবং সমতাবাদের (Egalitarianism) এক সুদীর্ঘ ও যুগান্তকারী সংগ্রাম। স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের বিধানাবলি হিন্দু সমাজকে বহিরাগত আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রচিত হইলেও, কালক্রমে তাহা সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবৈষম্য ও নিপীড়নের এক নগ্ন হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছিল। অপরদিকে, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন সেই অবরুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত সমাজের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করিয়া এক মুক্ত, অবারিত ও মানবিক জনপরিসরের (Public Sphere) জন্ম দিয়াছিল।

অহংকারের পতন ও মানবিকতার জয়গান: ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল ভিত্তি ছিল জন্মগত অহংকার এবং অস্পৃশ্যতার দম্ভ। শ্রীচৈতন্যদেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সমাজদেহ হইতে এই ব্যাধি সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর আবশ্যক। তাই তিনি স্বীয় রচিত 'শিক্ষাষ্টকম্'-এর তৃতীয় শ্লোকে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজতত্ত্বের চরম ও পরম নীতিবাক্যটি ঘোষণা করিলেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" *[১৯]*

তাৎপর্য: নিজেকে পথিমধ্যস্থিত তৃণের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া, বৃক্ষের ন্যায় অপরিসীম সহিষ্ণু হইয়া এবং নিজে সমস্ত অভিমান বা অহংকার শূন্য হইয়া অপর সকলকে সম্মান প্রদানপূর্বক সর্বদা শ্রীহরির নাম কীর্তন করিবে।

সমাজবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে বিচার করিলে, এই শ্লোক কেবল পারমার্থিক দৈন্যের প্রকাশ নহে; ইহা ছিল স্মার্ত পণ্ডিতগণের বিদ্যা, কুল ও আভিজাত্যের অহংকারের বিরুদ্ধে এক সুকঠোর চপেটাঘাত। অপরকে সম্মান প্রদর্শন ('মানদেন') করিবার এই ঐশী নির্দেশ সমাজদেহ হইতে অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের ভেদাভেদ দূর করিবার এক অমোঘ মন্ত্র রূপে কার্য করিয়াছিল। যিনি নিজেকে তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্র ভাবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের কোনো কৃত্রিম ভেদাভেদ থাকিতে পারে না।

মাতৃভাষার ক্ষমতায়ন ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ: এই আদর্শগত দ্বন্দ্বের অন্যতম সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়িয়াছিল বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের উপর। স্মার্ত সমাজ পরমার্থ চর্চাকে কেবল দেবভাষা সংস্কৃতের লৌহকপাটে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, যাহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সংস্কৃতের এই একাধিপত্য চূর্ণ করিয়া সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে ধর্মচর্চা, সাহিত্য ও দর্শনের প্রধান বাহন রূপে স্বীকৃতি প্রদান করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ বাংলা ভাষায় জীবনীসাহিত্য, পদাবলি ও অনুবাদ সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব জোয়ার আসিল, যাহা প্রান্তিক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতায়নের (Intellectual Empowerment) এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। [২০]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবদান হইল বাংলা ভাষায় রচিত সুবিশাল ও সুলিখিত জীবনীসাহিত্য। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কেবল শ্রীচৈতন্যের জীবনী নহে, বস্তুতপক্ষে ইহা তৎকালীন বঙ্গসমাজের এক প্রামাণ্য সামাজিক ও ঐতিহাসিক দলিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁহার গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোকের পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, গূঢ় তত্ত্ব সাধারণ মানবকে বুঝাইবার নিমিত্তই তিনি মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন:

"অতএব কহি আমি ভাষায় গাঁথিয়া।

বুঝিতে সভার হয়, শুন মন দিয়া॥"

উপমা: উপমা প্রয়োগ করিয়া বলা যায়—কালান্তক রজনীর অবসানে পূর্বগগনে যখন নবীন সূর্যের অরুণোদয় ঘটে, তখন নিশাচর অন্ধকারের সমস্ত বিভীষিকা যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিরোহিত হইয়া যায়; স্মার্ত অনুশাসনের দীর্ঘ অমানিশার শেষে শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির আলোকরশ্মিও তেমনই বঙ্গসমাজের সমস্ত কলুষতা, বঞ্চনা ও অসাম্যের অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া এক আলোকিত নবপ্রভাতের সূচনা করিয়াছিল। শুষ্ক কাঠামোর উপর প্রেমের যে লতা তিনি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাই শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙালি মননকে সিঞ্চিত করিয়াছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন: পরিশেষে বলা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন কেবল একটি নিছক ধর্মীয় মতবাদ বা ঈশ্বর আরাধনার নবরূপ ছিল না; বাংলার সমাজ-ইতিহাসে ইহা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের (Bengal Renaissance) আদিমতম ও প্রথম সার্থক রূপ। বর্ণাশ্রমের নিগড় ভাঙিয়া, যবন ও অন্ত্যজকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব যে মানবধর্মের জয়গান গাহিয়াছিলেন, তাহা বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও মননে এক চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এই আন্দোলন যুগপৎভাবে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অহংকার, মন্দিরের স্থানিক আধিপত্য এবং সংস্কৃত ভাষার একচেটিয়া অধিকারকে চূর্ণ করিয়াছিল। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের তাত্ত্বিক সমতা, নগর-সংকীর্তনের সামাজিক প্রতিরোধ এবং মাতৃভাষার ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়া গৌড়ীয় দর্শন প্রমাণ করিয়াছিল যে, ঈশ্বর কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহেন। স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের পতন এবং বৈষ্ণব সমতাবাদের এই ঐতিহাসিক উত্থান প্রমাণ করে যে, সামাজিক নিপীড়ন ও কঠোর শাস্ত্রের শাসন দিয়া মানুষের আত্মাকে চিরকাল শৃঙ্খলিত রাখা যায় না। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত সাম্যবাদের এই ধারা পরবর্তী যুগে বাউল, ফকির ও অন্যান্য লোকায়ত ধর্মমতের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে—প্রেম, ভক্তি ও মানবিকতার প্লাবনে বর্ণ ও বৈষম্যের সমস্ত কৃত্রিম প্রাচীর একদিন না একদিন ধূলিসাৎ হইতে বাধ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সেই শাশ্বত মানবতারই সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় ইশতেহার। স্মার্ত আধিপত্যের পতন এবং বৈষ্ণব

সমতাবাদের এই উত্থান প্রমাণ করে যে, নিপীড়ন ও শাস্ত্রের শাসন দিয়া মানুষের আত্মাকে চিরকাল শৃঙ্খলিত রাখা যায় না; প্রেম, ভক্তি ও মানবিকতার প্লাবনে সমস্ত কৃত্রিম প্রাচীর একদিন না একদিন ধূলিসাৎ হইতে বাধ্য। [২১]

ফুটনোট ও রেফারেন্স :

- [১৯] শ্রীচৈতন্যদেব স্বরচিত শিক্ষাষ্টকম্ (তৃতীয় শ্লোক)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সারাৎসার এবং অহংকারশূন্য সমতাবাদী সমাজের মূলভিত্তি রূপে এই শ্লোকটি সর্বজনস্বীকৃত।
- [২০] সেন, দীনেশচন্দ্র (১৮৯৬)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। কলিকাতা। (এই গ্রন্থে বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে)।
- [২১] মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস (১৯২৭)। বাংলার ইতিহাস। (গবেষক এখানে দেখাইয়াছেন কিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাংলার সমাজতাত্ত্বিক কাঠামোতে এক যুগান্তকারী ও স্থায়ী রূপান্তর আনিয়াছিল)।

তথ্যসূত্র **(References):** গ্রন্থপঞ্জি ও গবেষণাপত্র

- ক. প্রাথমিক সূত্র (Primary Sources / Original Texts):
- ১. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ। গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর দ্বারা প্রকাশিত। (দ্বাদশ স্কন্ধ , একাদশ স্কন্ধ , তৃতীয় স্কন্ধ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অংশ)।
- ২. মনু। মনুসংহিতা। অনুবাদ ও সম্পাদনা: পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।
- ৩. শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্। (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সারাৎসার)
- ৪. দাস, বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্যভাগবত। গৌড়ীয় মিশন, কলিকাতা।(আদি খণ্ড , মধ্যখণ্ড ও অন্ত্যখণ্ড)।
- ৫.কবিরাজ, কৃষ্ণদাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।(আদিলীলা,মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা)।
- ৬. গোস্বামী, রূপ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।
- ৭. গোস্বামী, সনাতন ও গোস্বামী, গোপাল ভট্ট। শ্রীহরিভক্তিবিলাস। (দশম বিলাস ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অংশ)।
- ৮. শ্রীমদভগবদ্গীতা। (পঞ্চম, পঞ্চদশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়)।
- ৯. কঠোপনিষদ। (১.২.৫ শ্লোক)।
- খ. গৌণ সূত্র (Secondary Sources / Modern Research & Books):
- ১০. চক্রবর্তী, রমাকান্ত (১৯৮৫)। *Vaisnavism in Bengal: 1486-1900*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।
- ১১. সেন, দীনেশচন্দ্র (১৮৯৬)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। কলিকাতা।
- ১২. মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস (১৯২৭)। বাংলার ইতিহাস।
- ১৩. সান্যাল, হিতেশরঞ্জন (১৯৮৯)। *Social Mobility in Bengal*। প্যাপাইরাস, কলিকাতা।
- ১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ (১৯৯২)। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্মার্ত প্রভাব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা।
- ১৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার (১৯৯৩)। ভক্তি আন্দোলন ও বাংলার সমাজ। কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা।
- ১৬. বসু, রামশঙ্কর (২০০১)। মধ্যযুগের বাংলায় ভক্তি আন্দোলন ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
- ১৭. সেন, অমর্ত্য (২০০৫)। *The Argumentative Indian*। Farrar, Straus and Giroux।

গবেষক ও সাহিত্যিক পরিচিতি: শ্রী অজয় কুমার দে (প্রণবনন্দন)

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার পোড়াডাঙ্গা গ্রামের এক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রী অজয় কুমার দে। ১৯৯২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করা এই মননশীল গবেষক ও সাহিত্যিকের পিতার নাম লক্ষ্মণ চন্দ্র দে এবং মাতার নাম মমতা দেবী।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মজীবন:
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতক (B.Sc.)। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে একজন পেশাদার রসায়নবিদ হিসেবে নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আধ্যাত্মিক ও সাহিত্য সাধনা:
বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তাঁর অন্তরের মূল আকর্ষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের একজন একনিষ্ঠ প্রচারক এবং ভাগবত পাঠক হিসেবে সুপরিচিত। বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বহু অনবদ্য পদাবলী রচনা করেছেন। সাহিত্য জগতে তিনি 'প্রণবনন্দন' ভণিতা বা ছদ্মনামে লেখালেখি করেন। প্রেম, ভক্তি ও গভীর দার্শনিক জ্ঞানের এক অপূর্ব মেলবন্ধন তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে। তাঁর এই নিরন্তর ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্য সাধনাকে 'চির প্রবাহিত স্রোত'-এর উপমায় ভূষিত করা হয়।

স্বীকৃতি ও সম্মাননা:
সাহিত্য চর্চা এবং ধর্ম প্রচারে তাঁর এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি মর্যাদাপূর্ণ নজরুল আওয়ার্ড এবং আকাদেমি সম্মান-সহ আরও বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। জ্ঞান ও ভক্তির এক সাকার মূর্তি হিসেবে তিনি ধ্রুপদী আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং আধুনিক মননশীলতার মধ্যে নিরন্তর সেতুবন্ধন করে চলেছেন।